

“কপ-৩১ ও বাংলাদেশের অগ্রাধিকার: নাগরিক সমাজের প্রত্যাশা”

জলবায়ু সংকট, কৃষি ও নারী; অভিযোজন, অর্থায়ন ও নায্যতা

১. প্রারম্ভিকা

বিগত কয়েকটি জলবায়ু সম্মেলনে (কপ) জলবায়ু অর্থায়ন, অভিযোজন, লস অ্যান্ড ড্যামেজ এবং নায্য বুপান্তরের মতো বিষয়গুলো আন্তর্জাতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে। কপ-২৯-এ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ২০৩৫ সালের মধ্যে বছরে অন্তত ৩০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার জলবায়ু অর্থায়নের নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও পাবলিক-প্রাইভেট উৎস থেকে বছরে ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলার পর্যন্ত অর্থায়ন বাড়ানোর আহ্বান জানানো হয়। কপ-৩০-এ বৈশ্বিক অভিযোজন লক্ষ্যের অগ্রগতি পরিমাপের জন্য *Belém Adaptation Indicators* গ্রহণ এবং ২০৩৫ সালের মধ্যে অভিযোজন অর্থায়ন তিনগুণ করার আহ্বান জানানো হয়।

তবে প্রতিশ্রুতি, প্রয়োজন ও বাস্তবায়নের মধ্যে ব্যবধান অনেক গভীর। অভিযোজন ও জলবায়ু সহনশীলতার প্রয়োজনের তুলনায় আন্তর্জাতিক অর্থায়ন অপ্রতুল; পাশাপাশি অর্থায়নের ধরন, প্রবেশাধিকার, পূর্বানুমোদন এবং সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর কাছে এর কার্যকর পৌঁছানোও বড় চ্যালেঞ্জ। লস অ্যান্ড ড্যামেজের ক্ষেত্রেও প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতি হলেও অর্থায়ন এখনও ক্রমবর্ধমান ক্ষয়ক্ষতির তুলনায় অপর্যাপ্ত। ফলে জলবায়ু অর্থায়ন বাংলাদেশের জন্য শুধু জলবায়ু নীতির বিষয় নয়; এটি খাদ্যনিরাপত্তা, জীবিকা, দারিদ্র্য হ্রাস ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্ন।

তাই কপ-৩১-এ আমাদের দাবি; নতুন প্রতিশ্রুতি নয়, বরং বিদ্যমান প্রতিশ্রুতিগুলোর কার্যকর বাস্তবায়ন। অভিযোজন অর্থায়ন হতে হবে পর্যাপ্ত, পূর্বানুমোদন, সহজলভ্য ও মূলত অনুদানভিত্তিক; ঋণনির্ভরতার পরিবর্তে নতুন ও অতিরিক্ত পাবলিক ফাইন্যান্সকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। একই সঙ্গে স্থানীয় পর্যায়ে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অর্থের কার্যকর প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে।

২. বৈশ্বিক তাপমাত্রা-১.৫°C: ফসিল ফুয়েল থেকে উত্তরণে প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবায়নের ঘাটতি

কপ-২৮-এর *Dubai Consensus*-এ জ্বালানি ব্যবস্থায় ফসিল ফুয়েল থেকে *just, orderly and equitable transition*-এর আহ্বান জানানো হলেও, কপ-৩০-এর বেলেম সম্মেলনে ফসিল ফুয়েল নিয়ে কোনো নতুন শক্তিশালী বা বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়নি। চূড়ান্ত *Mutirão* সিদ্ধান্তে ফসিল ফুয়েলের সরাসরি উল্লেখও রাখা হয়নি। ফসিল ফুয়েল থেকে উত্তরণের জন্য একটি *roadmap* তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হলেও সেটি আনুষ্ঠানিক আলোচনাভিত্তিক (negotiated) সিদ্ধান্ত নয়, বরং COP30 Presidency-এর একটি স্বেচ্ছাভিত্তিক উদ্যোগ; এতে দেশভিত্তিক বাধ্যতামূলক লক্ষ্য, সময়সীমা বা দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়নি। ফলে ১.৫°C লক্ষ্য রক্ষার ক্ষেত্রে বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি এখনও প্রয়োজনীয় বাস্তব ও বাধ্যতামূলক পদক্ষেপে রূপ নেয়নি।

আমাদের দাবি: ১.৫°C তাপমাত্রা সীমা রক্ষায় ফসিল ফুয়েল থেকে দ্রুত, ন্যায়সংগত ও পরিকল্পিত উত্তরণকে বাস্তব পদক্ষেপে রূপ দিতে হবে। এ লক্ষ্যে— (ক) ফসিল ফুয়েলের ব্যবহার ও নির্ভরতা দ্রুত কমিয়ে আনতে হবে এবং নতুন ফসিল ফুয়েল সম্প্রসারণ থেকে সরে আসতে হবে; (খ) নবায়নযোগ্য জ্বালানির সক্ষমতা দ্রুত বাড়াতে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক নবায়নযোগ্য জ্বালানি সক্ষমতা তিনগুণ করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে হবে; (গ) জ্বালানি দক্ষতা দ্বিগুণ করার লক্ষ্য বাস্তবায়নে দ্রুত ও পরিমাপযোগ্য পদক্ষেপ নিতে হবে; (ঘ) ফসিল ফুয়েল থেকে উত্তরণের অগ্রগতি দেশভিত্তিক লক্ষ্য, সময়সীমা, সূচক ও নিয়মিত প্রতিবেদন দিয়ে পরিমাপ করতে হবে এবং অগ্রগতির ঘাটতির জন্য জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে; (ঙ) দেশগুলোর জাতীয় জলবায়ু পরিকল্পনা ও NDC-তে ১.৫°C -সামঞ্জস্যপূর্ণ ফসিল ফুয়েল উত্তরণ ও নির্গমন হ্রাসের সুস্পষ্ট পথ নির্ধারণ করতে হবে।

৩. জলবায়ু অর্থায়নের ঘাটতি শুধু অর্থের সংকট নয়; এটি ঐতিহাসিক দায়, দায়িত্ব ও ন্যায়তার প্রশ্ন:

৩.১ নীতি—প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবায়নে বিস্তর ঘাটতি: প্যারিস চুক্তি ও UNFCCC-তে জলবায়ু অর্থায়ন ও দায়িত্ব বন্টনের ক্ষেত্রে Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC), Polluter Pays Principle, UNFCCC Article 4.3 এবং Paris Agreement Article 9-এর মতো মৌলিক নীতি ও অঙ্গীকার রয়েছে। বাস্তবে এসব নীতি ও অঙ্গীকারের সঙ্গে বাস্তবায়নের ঘাটতি রয়েছে। উন্নত বিশ্ব নিজেদের ঐতিহাসিক দায় ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতার ফলে তুলনামূলক কম দায়ী অথচ অধিক ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে নিজেদের অভিযোজন ও জলবায়ু সক্ষমতা গড়ে তুলতে ঋণের বোঝা বহন করতে হচ্ছে। জলবায়ু ন্যায়বিচারের দাবি ছিলো—ঐতিহাসিক ও বর্তমান দায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দায়িত্ব ও ন্যায়ভাবে বণ্টিত হতে হবে।

(ক) জলবায়ু অর্থায়নের ধরন মূলত ঋণনির্ভর: উন্নত দেশগুলো দাবি করছে, ২০২৪ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য মোট ১৩৬.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার জলবায়ু অর্থায়ন প্রদান ও সংগঠিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ১০১.৬ বিলিয়ন ডলার ছিল সরকারি অর্থায়ন—যার ৬৭ শতাংশ বা ৬৮.৫ বিলিয়ন ডলার ঋণ, বিপরীতে ২৯ শতাংশ বা ২৯.৭ বিলিয়ন ডলার অনুদান এবং প্রায় ৩ শতাংশ ইকুইটি। বাকি ৩০.৫ বিলিয়ন ডলার এসেছে সরকারি অর্থায়নের মাধ্যমে সংগঠিত বেসরকারি অর্থ থেকে (OECD, 2026)।

(খ) ৩০০ বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্য (NCQG); প্রয়োজনের তুলনায় কতটা? বাকু সম্মেলনে (কপ-২৯-এ) ২০৩৫ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বছরে অন্তত ৩০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার জলবায়ু অর্থায়নের নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ এবং সব উৎস মিলিয়ে বছরে ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলার পর্যন্ত অর্থায়ন বাড়ানোর প্রচেষ্টার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু ৩০০ বিলিয়নের লক্ষ্যমাত্রা প্রশমন ও অভিযোজন—উভয় ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য, অথচ শুধু উন্নয়নশীল দেশগুলোর অভিযোজনের প্রয়োজনই ২০৩৫ সালে বছরে ৩১০—৩৬৫ বিলিয়ন ডলার হতে পারে (UNEP, *Adaptation Gap Report 2025*)। অর্থাৎ, শুধু অভিযোজনের প্রয়োজনই ৩০০ বিলিয়ন ডলারের মোট লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে।

৩.২. উন্নয়নশীল দেশগুলোর ঋণ সংকট; ঋণের পরিমাণের পাশাপাশি, উচ্চ খরচ ও অর্থায়ন বৈষম্য সংকট বাড়ছে: জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন বিষয়ক সম্মেলন (UNCTAD)—এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলোর বৈদেশিক ঋণ ১২.৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে এবং একই বছরে ঋণ পরিশোধ হয়েছে প্রায় ১.৬ ট্রিলিয়ন ডলার। ২০১৫—২০২৫ সময়ে ঋণ ৬৫ শতাংশ বাড়লেও ঋণ পরিশোধের চাপ বেড়েছে ৮১ শতাংশ। স্বল্পোন্নত দেশগুলো (LDCs) ২০২৫ সালে তাদের রপ্তানি আয়ের ১৮.২ শতাংশ বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে ব্যয় করেছে। ঋণের সুদের চাপও দ্রুত বাড়ছে। ২০২৪ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলো বৈদেশিক ঋণের সুদ বাবদ ৩৮৪ বিলিয়ন ডলার পরিশোধ করেছে। UNCTAD-এর হিসাবে, উন্নয়নশীল দেশগুলো উন্নত দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশি সুদে ঋণ গ্রহণ করে। একই ধরনের সুদের হারে ঋণ নেওয়ার সুযোগ পেলে ৯৪টি উন্নয়নশীল দেশ বছরে প্রায় ৫০০ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত সুদ সাশ্রয় করতে পারত। ফলে ২০১৮—২০২৪ সময়ে ৯৯টি উন্নয়নশীল দেশ, যেখানে প্রায় ৫.৫ বিলিয়ন মানুষ বসবাস করে, বাড়তি সুদ পরিশোধের কারণে উন্নয়ন ব্যয়ের আর্থিক সক্ষমতা হারিয়েছে। এতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা ও জলবায়ু অভিযোজনের মতো খাতে বিনিয়োগের সুযোগ সংকুচিত হচ্ছে।

৩.৩ অভিযোজন অর্থায়ন: বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি ও বাংলাদেশের বাস্তবতা: জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অভিযোজন অর্থায়নের প্রয়োজন দ্রুত বাড়ছে, কিন্তু প্রয়োজন ও বাস্তব অর্থপ্রবাহের মধ্যে ব্যবধান অনেক। UNEP-এর *Adaptation Gap Report 2025* অনুযায়ী, উন্নয়নশীল

দেশগুলোর অভিযোজনের জন্য ২০৩৫ সালে বছরে প্রায় ৩১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন হতে পারে; NDC ও NAP-এর চাহিদা বিবেচনায় এ প্রয়োজন ৩৬৫ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত হতে পারে। বিপরীতে, ২০২৩ সালে আন্তর্জাতিক সরকারি অভিযোজন অর্থায়নের প্রবাহ ছিল মাত্র ২৬ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ প্রয়োজন বর্তমান প্রবাহের তুলনায় প্রায় ১২-১৪ গুণ বেশি, এবং বার্ষিক ঘাটতি ২৮৪-৩৩৯ বিলিয়ন ডলার। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (LDCs) জন্যও ঘাটতি বড় উদ্বেগের বিষয়। LDC Group ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতি বছর অন্তত ১২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার নতুন ও অতিরিক্ত, অনুদানভিত্তিক অভিযোজন অর্থায়ন নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে।

বাংলাদেশের অভিযোজন অর্থায়নের ঘাটতি: জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (NAP) ২০২৩-২০৫০ বাস্তবায়নে প্রায় ২৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, অর্থাৎ বছরে গড়ে ৮.৫ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন; এর মধ্যে বছরে প্রায় ৬ বিলিয়ন ডলার আন্তর্জাতিক উৎস থেকে সংগ্রহের প্রয়োজন। অন্যদিকে, বাংলাদেশের NDC 3.0 অনুযায়ী, ২০২১-২০২৩ সময়ে আন্তর্জাতিক উৎস থেকে অভিযোজন অর্থায়ন এসেছে গড়ে মাত্র ০.৪ বিলিয়ন ডলার বছরে। একই সময়ে মোট অভিযোজন অর্থায়ন ছিল প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার বছরে, যার ৮৮ শতাংশ এসেছে সরকারি বাজেট থেকে। ফলে NAP-এর প্রয়োজনের তুলনায় বছরে প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন ডলার বা ৫৩ শতাংশ ঘাটতি রয়েছে।

৩.৪ লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ড: দুর্যোগের সময় অর্থ না এলে ফান্ডের কার্যকারিতা কোথায়? নেপালের ২০২৬ সালের ভয়াবহ “Rasuwa-Bhotekoshi” বন্যা Loss and Damage Fund-এর কার্যকারিতা নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব পরীক্ষা তৈরি করেছে। নেপাল আগে জমা দেওয়া তিনটি প্রস্তাবের ভিত্তিতে ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন অনুমোদন পেলেও, ২৬ আগস্টের ভয়াবহ বন্যার পর জরুরি সহায়তার জন্য আলাদা ২০ মিলিয়ন ডলারের আবেদন করতে হয়েছে, যা তখনও অনুমোদনের অপেক্ষায় ছিল। একই সময়ে, প্রথম অর্থায়ন চক্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ১৭৬টি আবেদন মিলিয়ে প্রায় ২.৮ বিলিয়ন ডলার চাওয়া হলেও Fund মাত্র ৩৪২ মিলিয়ন ডলার অর্থায়নের জন্য available করেছিল। সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত এই অর্থায়ন থেকে কোনো দুর্যোগপীড়িত দেশে অর্থ বিতরণ শুরু হয়নি।

৩. ৫ কপ-৩১ ও আমাদের দাবি: জলবায়ু অর্থায়নে প্রতিশ্রুতি থেকে বাস্তবায়নে যেতে হবে

কপ-৩১-এ বাংলাদেশকে জোরালোভাবে বলতে হবে—জলবায়ু অর্থায়নে এখন শুধু নতুন অঙ্কের প্রতিশ্রুতি নয়; প্রতিশ্রুত অর্থের বাস্তবায়ন, অর্থায়নের গুণগত মান এবং সহজ ও সরাসরি প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। উন্নত দেশগুলোকে Paris Agreement-এর Article 9.1-এর আওতায় তাদের অর্থায়নের দায়িত্ব বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দিতে হবে। COP30-এ গৃহীত অভিযোজন অর্থায়ন তিনগুণ করার লক্ষ্যকে **নতুন ও অতিরিক্ত, পর্যাপ্ত, এবং মূলত অনুদানভিত্তিক অর্থায়নের মাধ্যমে** বাস্তবায়ন করতে হবে।

আমাদের দাবি

(ক) প্রতিশ্রুত অর্থের বাস্তবায়ন ও জবাবদিহি: COP29-এর \$300 বিলিয়ন এবং COP30-এর ২০৩৫ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বছরে অন্তত \$1.3 ট্রিলিয়ন জলবায়ু অর্থায়ন mobilization-এর লক্ষ্যকে স্পষ্ট সময়সীমা, বার্ষিক মাইলফলক ও জবাবদিহিমূলক বাস্তবায়ন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

(খ) অর্থায়নের ধরন—অনুদানভিত্তিক ও সহজ সরাসরি অর্থপ্রবেশ নিশ্চিত করতে হবে: বিশেষ করে অভিযোজন, LDC ও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য জলবায়ু অর্থায়ন নতুন ঋণের বোঝা তৈরি না করে মূলত অনুদানভিত্তিক হতে হবে। একই সঙ্গে জটিল আবেদন, দীর্ঘ অনুমোদন প্রক্রিয়া ও অতিরিক্ত শর্ত কমিয়ে সহজ, দ্রুত, স্বচ্ছ ও সরাসরি অর্থপ্রবেশ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে অর্থ কার্যকরভাবে জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ দেশ ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান ও জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছায়। পর্যাপ্ত

concessional finance থাকলেও তা যেন ঋণ-নির্ভরতা আরও না বাড়ায়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

(গ) অভিযোজন অর্থায়ন তিনগুণ করার বাস্তবায়ন: COP30-এর অভিযোজন অর্থায়ন ২০৩৫ সালের মধ্যে তিনগুণ করার লক্ষ্যকে নতুন ও অতিরিক্ত, পর্যাপ্ত, এবং মূলত অনুদানভিত্তিক অর্থায়নের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে। LDC Group-এর দাবি অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে বছরে অন্তত \$120 বিলিয়ন নতুন ও অতিরিক্ত অনুদানভিত্তিক অভিযোজন অর্থায়নের একটি স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করা উচিত।

(ঘ) Loss & Damage অর্থায়ন—দ্রুত, সরাসরি ও কার্যকর: FRLD-কে শুধু প্রতিষ্ঠিত একটি তহবিল হিসেবে নয়, দুর্যোগের সময় দ্রুত সাড়া দিতে সক্ষম কার্যকর অর্থায়ন ব্যবস্থায় পরিণত করতে হবে। এজন্য পর্যাপ্ত ও নতুন অর্থায়ন, সরাসরি প্রবেশাধিকার, জরুরি পরিস্থিতির জন্য দ্রুত-অ্যাক্সেস ব্যবস্থা এবং মূলত অনুদানভিত্তিক অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে। চাহিদার তুলনায় FRLD অত্যন্ত সীমিত, direct-access modalities এবং ২০২৫-২৬ সময়ের জন্য মাত্র \$250 মিলিয়ন grant-based interventions-এর প্রাথমিক ব্যবস্থা করেছে; COP31-এর বাস্তবতা, কার্যকারিতা ও পরিসর বাড়াতে হবে।

(ঙ) ফসিল ফুয়েল থেকে উত্তরণে অর্থায়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর নিশ্চিত করতে হবে: উন্নয়নশীল দেশগুলোর ফসিল ফুয়েল নির্ভরতা কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জ্বালানি দক্ষতা ও পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ব্যবস্থায় দ্রুত রূপান্তরের জন্য পর্যাপ্ত, সহজলভ্য ও মূলত অনুদানভিত্তিক অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জ্বালানি দক্ষতা, বিদ্যুৎ গ্রিড ও শক্তি সঞ্চয় (storage)-সহ প্রয়োজনীয় জলবায়ু প্রযুক্তির উন্নয়ন, হস্তান্তর ও স্থানীয় সক্ষমতা জোরদার করতে হবে।

8. Global Goal on Adaptation (GGA)-এর সূচক: জাতীয় হিসাবের বাইরে স্থানীয় বাস্তবতা কতটা প্রতিফলিত হবে?

বেলেম সম্মেলনে (কপ-৩০-এ) ৫৯টি *Belém Adaptation Indicators* গ্রহণ GGA বাস্তবায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। এসব সূচক পানি ও স্যানিটেশন, খাদ্য ও কৃষি, স্বাস্থ্য, বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্য, অবকাঠামো ও মানব বসতি, দারিদ্র্য ও জীবিকা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসহ ১১টি লক্ষ্য -এর অগ্রগতি পরিমাপের কাঠামো দিয়েছে। তবে এগুলো কীভাবে মাপা হবে, কী তথ্য ব্যবহার করা হবে এবং জাতীয় ব্যবস্থার সঙ্গে কীভাবে যুক্ত হবে—এসব কাজ এখনও চলমান। বড় প্রশ্ন হলো, জাতীয় পর্যায়ে গড় তথ্যের বাইরে স্থানীয় পর্যায়ে কারা কতটা উপকৃত হচ্ছে, কারা পিছিয়ে থাকছে এবং অভিযোজনের সিদ্ধান্তে কার কতটা ভূমিকা রয়েছে—তা কীভাবে দৃশ্যমান হবে? উপকূলীয় চর ও দ্বীপ, লবণাক্ততাপ্রবণ এলাকা, নারী কৃষক, ক্ষুদ্র কৃষকসহ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর বাস্তব পরিবর্তন জাতীয় গড় দিয়ে যথাযথভাবে বোঝা সম্ভব নয়।

আমাদের দাবি: GGA-এর সূচক শুধু জাতীয় হিসাবের হাতিয়ার নয়; স্থানীয় বাস্তবতা, অংশগ্রহণ ও অর্থায়নের ফলাফল দৃশ্যমান করার হাতিয়ার হতে হবে। GGA-এর সূচকগুলোকে স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য, মানুষের অংশগ্রহণ এবং অভিযোজনের বাস্তব ফলাফলের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। শুধু কতটি প্রকল্প বা অবকাঠামো হয়েছে তা নয়, কৃষকের উৎপাদন, পানি ও খাদ্যনিরাপত্তা, জীবিকা, আয়, জলবায়ুজনিত ক্ষতি ও অভিযোজন সক্ষমতায় কী পরিবর্তন এসেছে—তা পরিমাপ করতে হবে। একই সঙ্গে স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী, নারী কৃষক, স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় সংগঠনকে পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে অর্থবহভাবে যুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ, যাদের জন্য অভিযোজন, তাদেরকেই অভিযোজনের অগ্রগতি নির্ধারণ ও মূল্যায়নের প্রক্রিয়ায় যুক্ত করতে হবে। এটি *Locally Led Adaptation*-এর মূল নীতির সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৫. উপকূলে জলবায়ু সংকট: কৃষি ও নারী কৃষকের বাস্তবতা

৫.১ কৃষি ও খাদ্যনিরাপত্তার ওপর ক্রমবর্ধমান জলবায়ুর প্রভাব

বাংলাদেশের খাদ্যনিরাপত্তা কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত, আর কৃষি ক্রমবর্ধমানভাবে জলবায়ু ঝুঁকির মুখে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততা,

তাপমাত্রা বৃদ্ধি, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, খরা ও জলাবদ্ধতা কৃষি উৎপাদন, জীবিকা ও খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় একসঙ্গে চাপ তৈরি করছে। ২০২৪ সালে বাংলাদেশে মোট ৬৯.০৯ মিলিয়ন মানুষ কর্মরত ছিল, যার মধ্যে কৃষিতে প্রায় ৩০.৮৭ মিলিয়ন—অর্থাৎ মোট কর্মসংস্থানের ৪৪.৬৭%।
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS)-এর Labour Force Survey 2024 / ফলে কৃষিতে জলবায়ু অভিঘাতের প্রভাব কৃষক পরিবারের বাইরে বৃহত্তর অর্থনীতি ও খাদ্যনিরাপত্তাতেও ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন গবেষণা বলছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ২০৩০ সালে বাংলাদেশের ধান ও গমের উৎপাদনশীলতায় সর্বোচ্চ প্রায় ১০% পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে। একই সঙ্গে, দীর্ঘমেয়াদি উষ্ণতা ও জলবায়ু ঝুঁকির প্রভাবে ক্ষতি আরও বাড়তে পারে।

বিশ্বব্যাংকের Country Climate and Development Report for Bangladesh অনুযায়ী, ২০৫০ সালের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন ও চরম আবহাওয়ার কারণে বাংলাদেশের কৃষি GDP-এর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হারানোর ঝুঁকি রয়েছে। একই প্রতিবেদনে দেখা যায়, গড় একটি ঘূর্ণিঝড়ের অর্থনৈতিক ক্ষতি বছরে প্রায় ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, আর তীব্র বন্যার ঘটনায় দেশের GDP এক বছরে ৯% পর্যন্ত কমে যেতে পারে।

খাদ্যনিরাপত্তার বর্তমান চিত্রও উদ্বেগজনক। ২০২৪ সালে বাংলাদেশের ৩০.৫% মানুষ মাঝারি বা তীব্র খাদ্য অনিরাপত্তায় এবং ১১.৪% তীব্র খাদ্য অনিরাপত্তায় ছিল। ২০৩০ সালের জাতীয় লক্ষ্য হলো এই হার যথাক্রমে ২৪.২% ও ৬%-এ নামিয়ে আনা। Global Nutrition Report. এদিকে, FAO-এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৬ সময়ে প্রায় ১৮.১ মিলিয়ন মানুষ acute food insecurity-এর উচ্চ ঝুঁকিতে থাকতে পারে; সাম্প্রতিক বন্যা কিছু এলাকায় কৃষি ও জীবিকাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

কেন এটি বাংলাদেশের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ? কারণ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জলবায়ু অভিঘাতের একটি চক্রাকার প্রভাব তৈরি হয়:

জলবায়ু অভিঘাত → ফসলের ক্ষতি → কৃষকের আয় কমে যাওয়া → খাদ্যের দাম/প্রাপ্যতায় চাপ → খাদ্যনিরাপত্তা হ্রাস → দারিদ্র্য ও ঋণের চাপ → পুনরায় দুর্বল অভিযোজন সক্ষমতা

তাই আমরা স্পষ্টতই বলতে চাই, খাদ্যনিরাপত্তা রক্ষা করতে কৃষি অভিযোজনকে কৃষিখাতের আলাদা কর্মসূচি হিসেবে না দেখে এটিকে খাদ্যনিরাপত্তা, জীবিকা, দারিদ্র্য হ্রাস এবং জলবায়ু ন্যায্যতার কেন্দ্রীয় অগ্রাধিকার হিসেবে দেখতে হবে।

৫.২ উপকূলে লবণাক্ততা: কৃষি, সুপেয় পানির দীর্ঘমেয়াদি সংকট

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা এখন আর শুধু কৃষিজমির সমস্যা নয়; এটি কৃষি উৎপাদন, সুপেয় পানি, জনস্বাস্থ্য ও জীবিকার ওপর একই সঙ্গে প্রভাব বিস্তার করছে। বাংলাদেশের ১৯টি উপকূলীয় জেলায় প্রায় ৪০ মিলিয়ন মানুষ বসবাস করে। বাংলাদেশ সরকারের National Adaptation Plan এবং বিশ্বব্যাংকের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, উপকূলীয় এলাকার প্রায় ১.০৬ মিলিয়ন হেক্টর বা ৬২ শতাংশ জমি কোনো না কোনো মাত্রায় মাটির লবণাক্ততায় আক্রান্ত।

লবণাক্ততার অন্যতম প্রভাব সুপেয় পানির সংকট; দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে নদী, পুকুর, মুক্ত জলাশয় ও ভূগর্ভস্থ পানিতে লবণাক্ততা বাড়ছে এই সংকট কৃষিকেও সরাসরি প্রভাবিত করছে। লবণাক্ত পানি সেচে ব্যবহারের ফলে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে এবং কৃষকের উৎপাদন ব্যয় ও ক্ষতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ৪ dS/m-এর বেশি মাটির লবণাক্ততায় উচ্চফলনশীল ধানের ফলন প্রায় ১৫.৬ শতাংশ কম হতে পারে।

আমাদের সুস্পষ্ট দাবি: সুপেয় পানির নিরাপত্তা ও স্থানীয় পানি অবকাঠামোতে বিনিয়োগ; → লবণসহিষ্ণু ও জলবায়ু-সহনশীল কৃষি প্রযুক্তি; → লবণাক্ততার নিয়মিত স্থানীয় পর্যায়ের মনিটরিং ও ম্যাপিং; → কৃষি-পানি-স্বাস্থ্যকে সমন্বিত করে অভিযোজন অর্থায়ন এবং নারী ও ক্ষুদ্র কৃষকের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক অভিযোজন বিনিয়োগ।

৬. উপকূলীয় নারী কৃষকদের জলবায়ু সংকট ও বৈষম্য:

(ক) কৃষিতে নারীর অবদান বড়, কিন্তু স্বীকৃতি কম: বাংলাদেশের কৃষি শ্রমশক্তিতে নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসংঘের ২০২৬ সালের International Year of the Woman Farmer বিষয়ক তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের কৃষিশ্রমশক্তির ৫৮% নারী; তারা ফসল উৎপাদন, পশুপালন, মৎস্য এবং ফসল-পরবর্তী কাজেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নারী কৃষিকাজ করলেও অনেক ক্ষেত্রে তাকে স্বতন্ত্র “কৃষক” বা economic producer হিসেবে নীতি, পরিসংখ্যান ও সেবায় যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হয় না।

(খ) জমির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে বৈষম্য: BBS-এর Agriculture Sample Census 2020 অনুযায়ী, কৃষি জমির মালিক/অধিকারধারীদের মধ্যে নারীর অংশ ১২.৩২%; owner holding-এর ক্ষেত্রে ১৩.১৮%। অর্থাৎ নারী কৃষকের বড় একটি অংশ জমিতে কাজ করলেও জমির মালিকানা ও সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ সীমিত।

(গ) কৃষিক্ষণ ও উৎপাদন সম্পদে প্রবেশাধিকার: নারী কৃষকের সমস্যা শুধু জমিই নয়— বরং কৃষিক্ষণ, বীজ, কৃষি উপকরণ, প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ, সম্প্রসারণ সেবা ও বাজার ব্যবস্থাপনায় প্রবেশাধিকার।

(ঘ) ন্যায্য মজুরি ও মজুরি বৈষম্য: নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে সমকাজে সমমজুরি এখনও একটি নীতিগত প্রশ্ন। বাংলাদেশ সরকারের কৃষি তথ্য সার্ভিসের নারী কৃষক বিষয়ক প্রকাশনাতোও কৃষিখাতে নারী শ্রমিকের মজুরি বৈষম্য দূর করা এবং সমকাজে সমমজুরি নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হয়েছে।

(ঙ) বাজারে প্রবেশাধিকার ও ন্যায্য মূল্য: নারী কৃষকের উৎপাদন থাকলেই যথেষ্ট নয়; পণ্য কোথায় বিক্রি হবে, কে দাম নির্ধারণ করবে এবং নারী নিজে আয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন কি না—এসবও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

(চ) পানি সংকট ও নারীর অতিরিক্ত শ্রম: উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা ও নিরাপদ পানির সংকট কৃষি ও পরিবারের ওপর চাপ বাড়ায়। ফলে পানি সংগ্রহের দায়িত্ব নারীর ওপর পড়লে কৃষিকাজের পাশাপাশি অতিরিক্ত সময় ও শ্রম ব্যয় হয়।

(ছ) শিক্ষা, দক্ষতা, প্রযুক্তি ও কৃষি সম্প্রসারণে বৈষম্য: নারী কৃষকের কৃষি তথ্য, প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ সেবায় অংশগ্রহণে বৈষম্য রয়েছে— নারী কৃষকের কৃষি সম্প্রসারণ সেবায় প্রবেশাধিকারে জমির মালিকানা, চলাচলের সীমাবদ্ধতা, সামাজিক রীতি, তথ্যপ্রাপ্তি ও প্রশিক্ষণের সুযোগ বাধা হিসেবে কাজ করে।

(জ) ডিজিটাল কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও নারী কৃষকের অংশগ্রহণে বাধা রয়েছে: FAO-এর ২০২৫ সালের বাংলাদেশ-ভারত বিষয়ক গবেষণায় বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীদের ক্ষেত্রে কম digital literacy, মোবাইল ফোন ও internet ব্যবহারের কম সুযোগ, mobility restrictions এবং সামাজিক norms-কে digital agricultural extension ব্যবহারের বাধা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

(ঝ) সামাজিক বৈষম্য ও নিরাপত্তা: বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও নারী নির্যাতন নারীর নিরাপত্তা, মর্যাদা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করে। ক্ষতিকর সামাজিক norms ও লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য নারীর চলাচল, কাজ ও জনপরিসরে অংশগ্রহণ সীমিত করে। পরিবার ও সমাজে নারীর মতামত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এখনও নানা বৈষম্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ফলে নারী, বিশেষত প্রান্তিক ও নারী কৃষকরা সহিংসতা, নিরাপত্তাহীনতা, সামাজিক চাপ ও অধিকারবঞ্চিত বহুমাত্রিক ঝুঁকিতে থাকে।

(ঞ) স্বাস্থ্যঝুঁকি বিশেষ করে উপকূলীয় নারী ও কিশোরীদের সংকট প্রকট হচ্ছে: ২০২৬ সালের BMJ Open গবেষণায় দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় দেখা যায়, কিছু পরিবারের পানীয় জলে সোডিয়ামের মাত্রা অত্যন্ত বেশি; ভূগর্ভস্থ/নলকূপের পানির ব্যবহারকারীদের মধ্যে গড় সোডিয়াম ঘনত্ব ৯৩৩ mg/L পর্যন্ত পাওয়া যায়। গবেষণায় ১,০০০ mg/L-এর বেশি সোডিয়ামযুক্ত পানি গ্রহণের

সঙ্গে উচ্চতর diastolic blood pressure-এর ২.৩ গুণ বেশি adjusted odds পাওয়া গেছে।

৭. জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনায় কৃষি ও নারী কৃষক:

বাংলাদেশের জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (NAP) ২০২৩–২০৫০-এ কৃষি ও নারী—উভয়কেই অভিযোজনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কৃষি খাতের ১২টি অভিযোজন হস্তক্ষেপে মোট প্রায় ১,৬৬৬ বিলিয়ন টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। এতে জলবায়ু-সহনশীল প্রযুক্তি, কৃষি বহুমুখীকরণ, কৃষকের সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রগোদনা ও বীমার পাশাপাশি নারীর জীবিকা, প্রযুক্তি ও আর্থিক সম্পদে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। NAP-এ নারীকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে যুক্ত করা, *gender-responsive budgeting* জোরদার করা এবং ঝুঁকিপূর্ণ নারীদের জন্য Climate Resilience Fund গঠনের কথাও রয়েছে।

তবে নীতিগত অঙ্গীকার ও লক্ষ্যভিত্তিক বাস্তবায়নের মধ্যে এখনও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি রয়েছে। NAP-এ নারীকে কৃষি অভিযোজনের অংশীজন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও নারী কৃষকের জন্য পৃথক ও ট্র্যাকযোগ্য অর্থায়ন, সরাসরি অর্থপ্রবেশ এবং উৎপাদন-সম্পদে প্রবেশাধিকারের কাঠামো আরও স্পষ্ট করা প্রয়োজন। বিশেষ করে কৃষি অভিযোজনের বড় বিনিয়োগের কত অংশ নারী কৃষকের কাছে পৌঁছাচ্ছে, তারা কী ধরনের ঋণ, বীমা, প্রযুক্তি ও কৃষি সম্প্রসারণ সেবা পাচ্ছেন এবং এর সুফল কতটা পাচ্ছেন—এসব তথ্য নিয়মিতভাবে জেন্ডার ভিত্তিকভাবে পরিমাপ ও প্রকাশ করা প্রয়োজন।

(খ) অভিযোজন পরিকল্পনায় মূলত সমস্যা কোথায়? অভিযোজন পরিকল্পনায় নারীকে শুধু “ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী” হিসেবে চিহ্নিত করা ই যথেষ্ট নয়। নারী কৃষকের নিজেদের প্রয়োজন, অভিজ্ঞতা ও অগ্রাধিকার পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাজেট নির্ধারণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের সিদ্ধান্তে কতটা প্রতিফলিত হচ্ছে, সেটিও নিশ্চিত করতে হবে। অর্থাৎ, নারী কৃষককে শুধু অভিযোজনের সুবিধাভোগী হিসেবে নয়, কৃষি উৎপাদন ও খাদ্যব্যবস্থার সক্রিয় অংশীজন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হিসেবে দেখতে হবে।

৮. নারী কৃষকদের জন্য নীতিগত অগ্রাধিকার ও বাস্তবায়নে

লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থা: আমাদের সুপারিশসমূহ

নারী কৃষককে শুধু “ঝুঁকিপূর্ণ নারী” বা “কৃষক” হিসেবে নয়, স্বতন্ত্র উৎপাদনকারী ও অর্থনৈতিক অংশীজন হিসেবে অভিযোজন নীতি ও অর্থায়নে স্বীকৃতি দিতে হবে। এজন্য—

(ক) নির্দিষ্ট ও ট্র্যাকযোগ্য অর্থায়ন: কৃষি অভিযোজনের বড় বিনিয়োগের মধ্যে নারী কৃষকের জন্য নির্দিষ্ট ও ট্র্যাকযোগ্য অর্থায়ন (নারী কৃষকের জন্য কত টাকা বরাদ্দ হলো এবং সেই টাকা বাস্তবে নারী কৃষকের কাছে কতটা পৌঁছাল তা হিসাব করে দেখা) নিয়মিত পরিমাপ করতে হবে। Gender-responsive budgeting-কে শুধু বরাদ্দ নয়, ফলাফলভিত্তিক জবাবদিহির সঙ্গেও যুক্ত করতে হবে।

(খ) উৎপাদন সম্পদ ও সেবায় সমান প্রবেশাধিকার: নারী কৃষকের জমি, কৃষিঋণ, বীজ ও অন্যান্য উৎপাদন উপকরণ, জলবায়ু-সহনশীল প্রযুক্তি, কৃষি সম্প্রসারণ সেবা, বীমা ও বাজারে প্রবেশাধিকার ও নিয়ন্ত্রণ সহ কাঠামোগত সীমাবদ্ধতাসমূহ দূরীকরণের উদ্যোগ নিতে হবে।

(গ) সিদ্ধান্ত গ্রহণে অর্থবহ অংশগ্রহণ: স্থানীয় অভিযোজন পরিকল্পনা ও কৃষি-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী কৃষকের অর্থবহ অংশগ্রহণ, নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নিশ্চিত করতে হবে। নারী কৃষক ও নারী-নেতৃত্বাধীন সংগঠনকে শুধু সুবিধাভোগী নয়, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(ঘ) প্রযুক্তি ও সেবায় নারী কৃষকের বাস্তব প্রয়োজন: জলবায়ু-সহনশীল প্রযুক্তি, বীজ, কৃষিযন্ত্র ও কৃষি সেবা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী কৃষকের বাস্তব প্রয়োজন, ব্যবহারযোগ্যতা এবং সময় ও শ্রমের বোঝা বিবেচনায় নিতে হবে। কৃষি অভিযোজন কর্মসূচিতে নারীর নির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুযায়ী প্রযুক্তি, সম্প্রসারণ ও কৃষি-অর্থায়নে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

(ঙ) নারী কৃষকের বাস্তব অগ্রগতি পরিমাপ: NAP বাস্তবায়নের M&E ব্যবস্থায় শুধু কতজন নারী উপকৃত হয়েছেন তা নয়; উৎপাদন, আয়, সম্পদে প্রবেশাধিকার, ক্ষয়ক্ষতি, সময়-শ্রমের বোঝা এবং অভিযোজন সক্ষমতায় বাস্তব পরিবর্তন পরিমাপ ও প্রকাশ করতে হবে।

(চ) সরাসরি ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থপ্রবেশ: নারী কৃষক ও নারী-নেতৃত্বাধীন সংগঠনের জন্য সহজ, সরাসরি, পূর্বানুমানযোগ্য ও দীর্ঘমেয়াদি অভিযোজন অর্থায়নে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে, যাতে স্থানীয় পর্যায়ে তারা শুধু অর্থের গ্রহীতা নয়, বরং বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। নারী কৃষকের অর্থায়নে প্রবেশের ক্ষেত্রে জামানত ও সম্পত্তির মালিকানার মতো কাঠামোগত বাধা দূর করতে হবে।

(ছ) বাজার ও আর্থিক সক্ষমতা: নারী কৃষকের বাজারসংযোগ, আর্থিক সক্ষমতা ও জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলার সক্ষমতা বাড়াতে কৃষি সম্প্রসারণ সেবা, বাজার তথ্য, আর্থিক সাক্ষরতা, সঞ্চয়-ঋণ ও বীমা ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের কার্যকরভাবে যুক্ত করতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ ও পরামর্শ সেবা জ্ঞান, প্রযুক্তি, মূল্যশৃঙ্খল ও বাজারে প্রবেশ এবং জলবায়ু অভিযোজন সক্ষমতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

(জ) ন্যায্য মজুরি ও মজুরি বৈষম্য দূরীকরণ: কৃষিখাতে নারী শ্রমিকের শ্রমের যথাযথ মূল্যায়ন ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। সমকাজে সমমজুরি নীতি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করে নারী ও পুরুষ কৃষিশ্রমিকের মজুরি বৈষম্য দূর করতে হবে এবং এ বিষয়ে কার্যকর মনিটরিং ও জবাবদিহি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

(ঝ) লবণাক্ততাকে আন্তঃজাতীয় জলবায়ু সংকট হিসেবে বিবেচনা: উপকূলের লবণাক্ততাকে শুধু কৃষি বা পানি খাতের সমস্যা হিসেবে দেখা যাবে না। এটি কৃষি উৎপাদন, সুপেয় পানি, স্বাস্থ্য, নারী ও পরিবারের জীবিকা—সবকিছুকে একই সঙ্গে প্রভাবিত করা একটি আন্তঃজাতীয় জলবায়ু সংকট; তাই অভিযোজন পরিকল্পনা ও বিনিয়োগেও এর সমন্বিত প্রতিফলন থাকতে হবে।

শেষ কথা, কৃষিতে জলবায়ু অভিযোজনের বিনিয়োগ তখনই ন্যায্য ও কার্যকর হবে, যখন নারী কৃষকের জন্য শুধু অর্থ বরাদ্দ নয়—সম্পদে প্রবেশাধিকার, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, প্রযুক্তি ও বাজারে অংশগ্রহণ এবং বাস্তব সুফল নিশ্চিত হবে।

প্রযত্নে, কোস্ট ফাউন্ডেশন
ঠিকানা: মেট্রো মেলোডি, বাড়ী-১৩, রোড নং-০২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭।